



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 525 - 532

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

হরিশংকর জলদাসের ‘মৎস্যগন্ধা’ উপন্যাস : একটি উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর দ্বন্দ্ব

খুকুমণি বাগ

গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

কোস্টাল এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ রিসার্চ সেন্টার

এগরা সারদা শশিভূষণ কলেজ

ও

ড. শান্তনু দলাই

সহযোগী অধ্যাপক

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

এগরা সারদা শশিভূষণ কলেজ

Email ID : drsantanudalai81@gmail.com

Received Date 20. 12. 2024

Selection Date 01. 02. 2025

Keyword

Harishankar
Jaldas,
Jalaputra,
Matsyagandha.

Abstract

Harishankar Jaldas in his novel 'Jalaputra' (2008) has shown the aspect of fishermen's profession. In this novel, we get a description of what disaster the fishermen have to face when they catch fish in the sea like the Bay of Bengal, then when the fishermen bring the fish and take it in a dishonest businessman, the exploitation of moneylenders goes on indiscriminately. This professional humiliation and exploitation of fishermen is the subject of this novel. The author's of 'Matsyagandha' describes also the social status of fishermen. The history of how the fishermen were abused and deprived on the basis of caste in the caste society is recorded in this novel. The novel 'Matsyagandha' by Harishankar Jaldas was first published in February 2020 from Bangladesh.

Discussion

‘মৎস্যগন্ধা’ উপন্যাসের প্রেক্ষাপট হরিশংকর জলদাস গ্রহণ করেছেন মহাভারত থেকে। কৈবর্ত কন্যা মৎস্যগন্ধার রাজমহিষী হয়ে ওঠার আখ্যান হল মৎস্যগন্ধা উপন্যাস। এই মৎস্যগন্ধাকে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র করে হরিশংকর জলদাস একটি তর্ক খাড়া করেছেন এই উপন্যাসে। সেই তর্কটি হল সমাজের জাত পাতের উর্ধ্বে বাস করা ব্রাহ্মণ জাতির সঙ্গে সমাজের একেবারে নিচু শ্রেণীতে বসবাসকারী জেলা নারীর তর্ক। আর সেই তর্কে লেখক এই মতকে প্রতিষ্ঠিত করেন যে, শাস্ত্র লেখে যারা তারা নিজেদের সুবিধামতো নিয়ম তৈরি করে। সেই সঙ্গে লেখক এও দেখান সুবিধাবাদী ব্রাহ্মণ সমাজের এই

নিয়মকে জেলে সমাজের মানুষ আর মানবেন না। তারা প্রশ্ন করবেন। এই উপন্যাসে ঋষি পরাশর মুনিকে নিরন্তর প্রশ্ন করে গেছেন মৎস্যগন্ধা।

জেলেদেরকে সমাজের একেবারে নিচু শ্রেণীতে নামিয়ে দিল কারা? কিভাবে জেলেরা সমাজে এত ঘৃণিত জীবে পরিণত হলেন তার একটা উত্তর হরিশংকর জলদাস তাঁর বর্ণবৈষম্যের শেকড়-বাকড় বইতে দিয়েছেন। উক্তিটি দীর্ঘ কিন্তু এই দীর্ঘ উক্তিটি এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন –

“আর্যরা ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ করলে দুটি জনজাতির মুখোমুখি হয়। এই জনগোষ্ঠীর ভাষা আলাদা সংস্কৃতি অন্যরকম। এদের দেহ গড়নও আর্যদের থেকে ভিন্ন। আর্যরা এই জনজাতির একটি নাম দেয় নিষাদ। দ্বিতীয় জনগোষ্ঠীর নাম দেয় দাস বা দস্যু। এই দাস বা দস্যুরা ছিল দ্রাবিড়ভাষী। ...দ্রাবিড়রা ছিল উন্নত এক জনগোষ্ঠী। মহেঞ্জোদারো হরপ্পার মত নগর সভ্যতার পত্তন আর বিস্তৃতিতে ছিল দ্রাবিড়দের বিশেষ অবদান। ভারতে প্রবেশ করে এই আর্যরা দ্রাবিড়দের বাধার সম্মুখীন হয়। উভয় জনজাতি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই সংঘর্ষে আর্যরা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল। নির্বিচারে দ্রাবিড়দের হত্যা করেছিল। সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিপুল ক্ষতিসাধন করেছিল। সিন্ধু উপত্যকার মানুষেরা দমে থাকেনি। কয়েকশো বছর ধরে আর্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিল। এই সময় আর্যরা ভারতের পূর্বতন অধিবাসীদের ঘৃণা করতে শুরু করে এবং শত্রুরূপে গণ্য করতে আরম্ভ করে। এই ঘৃণা আর হিংসাটা এতটাই গাঢ় হয়ে যায় যে দ্রাবিড়দের আর্যরা গোলাম এবং অপহরণকারী হিসেবে চিহ্নিত করে। দ্রাবিড়রা আর্যদের বশ্যতা স্বীকার না করে সুযোগ বুঝে আর্যদের আক্রমণ করতো এবং তাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিয়ে যেত। বশ্যতা স্বীকার না করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত বলে আর্যরা দ্রাবিড়দের কলঙ্কিত করবার জন্য উৎপীড়ক, লুণ্ঠক, ডাকাত - এসব নামে অভিহিত করত। ভারতের সিন্ধু উপত্যকা এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীদের পরাজিত করে আর্যরা যাদের বন্দী করতে পারতো তাদের নির্বিচারে হত্যা করত। কিন্তু পরে যখন আর্যদের মধ্যে গোলাম বা ভৃত্যের প্রয়োজন বেড়ে গেল তখন বন্দীদের হত্যা না করে তাদের গোলাম বা চাকরে পরিণত করত। পুরুষবন্দীরা গোলামী করে বেঁচে থাকার সুযোগ পেত। কিন্তু নারীদের ভাগ্য সেরকম ছিল না। কারণ তাদের যে শরীর আছে, সে শরীরে যে যৌবন আছে, আছে সুসমা। আর আছে আর্যদের দেহ ক্ষুধা মেটানোর ললিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তাই আর্যদের গোলামী করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেহ চাহিদাও বন্দী নারীদের মিটাতে হতো। হতে হতো রক্ষিতা বা উপপত্নী। আর্যরা সামষ্টিকভাবে যাদের দাস বা দস্যু নামে চিহ্নিত করেছিল তাদের মধ্যে নানা জনগোষ্ঠী ছিল। সেই জনজাতির একটির নাম শূদ্র। এই শূদ্র জনগোষ্ঠী আর্যদের বিরুদ্ধে সবচাইতে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। ওদের দ্বারাই সবচাইতে বেশি ক্ষতি হয়েছিল আর্যদের। তাই শূদ্রদের বিরুদ্ধে আর্যদের ছিল বিপুল ঘৃণা আর উত্তুঙ্গ ক্রোধ। পরবর্তীকালে অবস্থার পরিবর্তন হলো। শূদ্ররা হীনবল হয়ে পড়ল। আর্যদের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নিল এই জনগোষ্ঠী। পরাজয় স্বীকার করলেও শূদ্রদের ওপর ক্রোধ কমেনি আর্যদের। আর্যরা তাদের শাস্ত্রে, অনুশাসনে, আচরণে শূদ্রদের অবনমিত করল। চিহ্নিত করল বর্ণের জনজাতি হিসেবে। একদা ভারতবর্ষে শূদ্র নামের যে প্রবল এবং প্রাচীন জনগোষ্ঠীটি ছিল আর্যদের শাস্ত্রে-স্মৃতিতে সেই জনজাতি হয়ে গেল ভৃত্য বা গোলামের সমর্থক। আর্য ব্রাহ্মণরা তাদের, মানে শূদ্রদের চিহ্নিত করল চতুর্থ বর্ণ রূপে। পূর্বেই আর্য সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিনটি বর্ণ ছিল। শূদ্র বর্ণ দিয়ে প্রচলিত হয়েছিল চতুর্থ বর্ণটি।”

এই নমঃশূদ্রদের অন্তর্গত একটি জাতিগোষ্ঠীর নাম হল জেলে। আর্যদের বশ্যতা স্বীকার না করার ফলে যাদের কপালে জুটে ছিল অবাধ অপমান আর লাঞ্ছনা। তাই লেখক বলেন –

“যেহেতু আমি অনার্য সম্প্রদায়ের মানে শূদ্র বংশের, স্বভাবতই একটা ক্ষোভ তো আমার মধ্যে সর্বদা জাগরুক।”^২

কিন্তু হরিশংকর জলদাস একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে জেলে জীবন নিয়ে লিখতে বসেই তার উপন্যাসের মধ্যে এনেছেন প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ। এক অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় তিনি বলেছিলেন –

“আমার কথাসাহিত্যের মধ্যে শেষ কথা হল বর্ণ বিভাজনের নির্যাতনের যে বিষয় সেটা ঘুরেফিরে বারবার এসেছে। নদী উপকূলের মানুষের জীবনে হোক বা একটা ঘরে একটা গৃহকর্মীর জীবনে হোক বা সেখানে বর্ণবৈষম্য বললে সেখানে আমি ধর্মের যে বর্ণবৈষম্য সেটাকে বোঝাচ্ছি না, অর্থনৈতিক বৈষম্যটাকেও বোঝাচ্ছি। ...নির্যাতনের প্রতিবাদ করাই আমার লেখার মূল উদ্দেশ্য।”^৩

‘মৎস্যগন্ধা’ উপন্যাস তেমনি এক নির্যাতনের প্রতিবাদ স্বরূপ। যে নির্যাতন ঘটে গিয়েছিল মহাভারতের কালে। এক কৈবর্তকন্যা মৎস্যগন্ধার উপর ব্রাহ্মণবাদীদের অন্যতম হোতা ঋষি পরাশরের নির্যাতন। প্রাচীনকালের কোন জেলে কন্যার সম্মানহানির উদাহরণকে সামনে রেখে হরিশংকর জলদাস সমস্ত জেলে কন্যার ওপর (বা বলা ভালো সমগ্র নমঃশূদ্র কন্যার ওপর) জোর খাটিয়ে দেহ দখলের যে ইতিবৃত্তকে ব্রাহ্মণরা নিজেদের অধিকার বলে প্রতিপন্ন করে আসছিলেন ব্রাহ্মণবাদিতার সেই অন্ধকার দিককে লেখক তুলে ধরেন একবিংশ শতকের আলোতে, করে চলেন তার চুলচেরা বিশ্লেষণ। এক ঘরোয়া আলাপচারিতায় তিনি বলেন –

“মনুসংহিতার মধ্যে মনু বলেছেন যে তুমি জেলে মানে জেলে থাকবে। পেশা পরিবর্তন করতে পারবে না। তুমি মুচি মানে মুচি থাকবে। এবং সেখানে অনেকগুলো বেদনাদায়ক নির্দেশন আছে। একজন ব্রাহ্মণ ইচ্ছে করলে চার সম্প্রদায়ের নারীর সাথে উপগত হতে পারে। বৈশ্য শূদ্রদের মেয়েকে যখন ইচ্ছা কেড়ে নিয়ে আসতে পারে। এগুলোর বিচার হয়। কেমন বিচার হয় - এক পয়সা দুই পয়সা দিয়ে বিচার থেকে রেহাই পাবে। তার কোন শাস্তি হবে না। ...উল্টোদিকে কোন বৈশ্য বা শূদ্র ব্রাহ্মণ নারীর হাত ধরে তবে তার হাত কেটে দেওয়ার বিধান আছে, দেখলে চক্ষু উৎপাটন করার কথা আছে। তাহলে দেখো সমাজ ব্যবস্থাটা কত বৈষম্য পরায়ণ।”^৪

‘মৎস্যগন্ধা’ উপন্যাস শুরু হয়েছে মৎস্যগন্ধার জন্ম বৃত্তান্ত দিয়ে। মৎস্যগন্ধা যমুনা নদীতে যাত্রী পারাপার করে। কারণ তার পালকপিতা সিদ্ধচরণের অনেক বয়স, তিনি আর নৌকা চালনা করতে পারেন না। তার জাল নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে প্রবল ঝড়ের মুখে পড়ে ছিঁড়ে খুঁড়ে গেছে। ফলত অর্থ উপার্জনের আর কোন পথ নেই সিদ্ধচরণের সামনে। তিনি সবকিছু হারিয়েছেন। তাই মৎস্যগন্ধা বাধ্য হয়ে নৌকার দাঁড় তুলে নিয়েছেন হাতে। এই জায়গা থেকে মৎস্যগন্ধার পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে সে নৌকার মাঝি। মৎস্যগন্ধা একদিন যাত্রীর আশায় যমুনার কিনারে নৌকা ভাসিয়ে রেখে অপেক্ষা করছেন। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হবে এমন সময় পরাশর মুনি যাত্রী হিসেবে মৎস্যগন্ধার নৌকায় ওঠেন। আর এই পরাশর মুনিকে এই মৎস্যগন্ধা তার জন্ম বৃত্তান্ত শুনিয়ে চলেছেন।

স্বর্গ অঙ্গরা অদ্রিকা ছিলেন প্রজাপতি কচ্ছপ এবং দক্ষ কন্যার সন্তান। দীর্ঘদিন ধরে যমুনার পাড়ে একজন মুনি অমর হওয়ার আশায় তপস্যা করছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র অদ্রিকাকে নির্দেশ দিলেন ওই মুনির ধ্যান ভাঙাতে। প্রয়োজনে অদ্রিকা যেন তার রূপ যৌবনের ব্যবহার করতে না ভোলেন একথাও দেবরাজ ইন্দ্র বলে দিলেন। অদ্রিকা তাই যোগাসনে বসে থাকা মুনির উরুতে নিজের শরীরটাকে ছড়িয়ে দিলেন। তাতে মুনির অমর হওয়ার তপস্যা ভঙ্গ হওয়ায় তিনি অদ্রিকাকে মৎসী তে রূপান্তরিত হয়ে যমুনার জলে কলিযুগ পর্যন্ত বাস করার অভিশাপ দিলেন। অভিশাপ মুক্তির উপায়ও বলে দিলেন। তিনি বললেন মৎসী রূপী অবস্থায় দুটি মানব সন্তান প্রসব করলে তবেই মৎস্য রূপ থেকে অদ্রিকার মুক্তি ঘটবে।

চেদিরাজ্যের রাজা উপরিচর বসু স্বর্গবাসী পিতৃপুরুষের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষায় তিনি যজ্ঞের আয়োজন করলেন। এই যজ্ঞ করার আগেই রাজাকে মৃগয়ায় যেতে হয়। উপরিচর বসু মৃগয়ার জন্য অরণ্যে গিয়ে কামাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। তখন তিনি তার স্থলিত শুক্র রানী গিরিকার কাছে পাঠানোর আয়োজন করেন। একটি বটপত্রে স্থলিত শুক্রকে দিয়ে তিনি পঞ্জি নামক এক কুশলী বাজপাখিকে নির্দেশ দেন যে এই শুক্র যেন সে রানী গিরিকার কাছে পৌঁছে দেয়। কিন্তু সেই শুক্র রানী গিরিকার কাছ অঙ্গি পৌঁছাতে পারেনি। পথেই আরেক বাজপাখির আক্রমণে পঞ্জির মৃত্যু হলে বটপত্রে থাকার শুক্র যমুনার জলে পড়ে যায় এবং সেই শুক্র খেয়ে ফেলে অদ্রিকা। এরপরই অদ্রিকা গর্ভধারণ করে। এবং সন্তান প্রসবের প্রাক মুহূর্তেই সে সিন্ধু চরণের জালে ধরা পড়ে। তার পেট কেটে দুটি মানব সন্তান পায় সিন্ধুচরণ। একটি পুত্র সন্তান এবং একটি কন্যা সন্তান। পুত্র সন্তানটিকে রাজা উপরিচর বসু নিয়ে যান। আর কন্যা সন্তানটি হল মৎস্যগন্ধা, সে রয়ে যায় সিন্ধুচরণের কাছে। সে যৌবনবতী এখন। রাজার ঔরসে তার জন্ম হলেও যেহেতু সে মাহের পেটে জন্মেছে এবং নিঃসন্তান জেলে নি ভবানী তাকে মানুষ করেছে ফলত সে জেলে ঘরের সন্তান।

যমুনা নদীতে সন্ধ্যাকালে ঋষি পরাশর জেলে কন্যা মৎস্যগন্ধার সমগ্র জন্ম বৃত্তান্ত শোনার পর মৎস্যগন্ধাকে যে প্রস্তাবটি দেন সেটি ছিল এরকম –

“আমার প্রথম রিপু প্রবল হয়েছে বাসবি। আমার বাসনা পূরণ করো তুমি।”^৫

এটা ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে মৎস্যগন্ধার কাছে ঋষি পরাশরের অনুরোধ। তারপর মৎস্যগন্ধার বারংবার প্রত্যাখ্যানে এই অনুরোধ বলপ্রয়োগে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু এই অনুরোধ এবং বল প্রয়োগের মধ্যবর্তী সময়টোতেই লেখক হরিশংকর জলদাস ব্রাহ্মণ্যবাদের বর্ণবাদীতা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন রেখেছেন। মনুসংহিতার নিবিড় পাঠক হিসেবে লেখক খুব স্পষ্টভাবে জেনেছিলেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যেকোন বর্ণের নারীতেই উপগত হতে পারে এবং তা শারীরিক বল প্রয়োগের মাধ্যমেই পারে। দীর্ঘদিন ধরে এহেন নির্যাতন নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের নারীরা ভোগ করে আসছেন। একবিংশ শতাব্দীতে এসে লেখকের প্রশ্ন মৎস্যগন্ধার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন –

“ঋষির এ কী প্রস্তাব? নগ্ন। লাজ লজ্জা হীন! সে কি ক্রীড়নীয়? এরকম যাচ্ছেতাই প্রস্তাব সে নারী বলেই কি দিতে পারলেন ক্রান্তদর্শী এই ঋষি? এরকম প্রস্তাব কি নারীত্বের অপমান নয়? সে প্রান্ত সমাজের মেয়ে বলেই কি মুনি এরকম ঘৃণ্য প্রস্তাব করতে দ্বিধা করলেন না? ধীবর কন্যা বলেই তার কি কোন দাম নেই? সতীত্ব কুমারীত্ব বলে কি তার কিছুই থাকতে নেই?”^৬

লেখক হরিশংকর জলদাস অবশ্যই এই প্রশ্নগুলির প্রত্যক্ষ কোন উত্তর পাঠকুলকে দেন না। কিন্তু এই সমস্ত প্রশ্নগুলির সার্বিক একটা উত্তর তিনি বর্ণবৈষম্যের শেকড়বাকড় বইতে দিয়েছেন। যেহেতু মনু ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণবাদীতার যাবতীয় সুযোগ নিয়ে তিনি নিয়মাবলী তৈরি করেছেন। ফলত ব্রাহ্মণদের জন্য তিনি এই সুযোগ ছেড়েই দিয়েছেন যে ব্রাহ্মণেরা সব শ্রেণীর নারীকে ভোগ করার অধিকার রাখে এবং তার কোন বিচার হবে না। নিম্নবর্ণের নারীকে ভোগ করতে পারে কিন্তু তাকে তো মর্যাদা দেওয়া যায় না। তাই মৎস্যগন্ধা বোঝে –

“এই মুনি তো তাকে চিরসঙ্গিনী করে নিয়ে যাবে না। রতিক্রিয়া সম্পন্ন করে হেলায় ফেলে চলে যাবেন। মুনি পরাশরের কাছে সে ক্ষণিক উত্তেজনার ব্যবহার্য বস্তু ছাড়া তো বাড়তি কিছুই নয়!”^৭

ঋষি পরাশর তার প্রথম রিপু কামনার ক্ষণিক উত্তেজনাকে, সার্বিক দেহসম্ভোগের উদ্দেশ্যকে নির্মলতা দান করতে চান। কারণ যেহেতু ব্রাহ্মণ ঈশ্বরের মুখ থেকে সৃষ্ট ফলত তার সকল কার্যই পবিত্র। তাই রমণী সম্ভোগের কারণ হিসেবে তিনি বলেন যে তিনি পুত্র কামনার্থে মৎস্যগন্ধাকে রমণ করতে চান। কারণ মানুষকে যুগ থেকে যুগান্তরে নিয়ে যায় পুত্র। পরাশরের এই যুক্তি হাস্যকর। কেননা মানুষকে কেবলমাত্র পুত্রই যুগ থেকে যুগান্তরে নিয়ে যায় না। মানুষকে কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করে তার কর্ম। মানুষ তার যাবতীয় কু-ইচ্ছাকে আত্মপক্ষে আনার জন্য এমনই হাস্যকর বেদরদি যুক্তি

খাড়া করেন। প্রতিপক্ষ মৎস্যগন্ধার কাছে নিজেকে বিবেকবান হিসেবে প্রতিপন্ন করার জন্য পরাশর মুনি তার লালসাকে পুত্র লাভের অভিধায় ভূষিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু মৎস্যগন্ধার কাছে সেই বিবেকবান প্রস্তাব তার নিজের জীবনের বেদনাময় ইতিহাসকে বয়ে আনে –

“আবার সেই পুত্র বাসনা! সেই পুত্র মর্যাদা! আহ মৎস! আহ রাজা উপরিচর বসু! পুত্র বাসনার কারণেই তো আমি পরিতক্ত! যমুনা ঘাটের পারানি।”^৮

অদ্রিকা নামক মৎসীর গর্ভে যে দুটি মানব সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে পুত্র সন্তানটি ছিল গৌরবর্ণ এবং কন্যাটি ছিল ঘন কৃষ্ণবর্ণ। রাজা উপরিচর বসু দাশরাজা সিন্ধুচরণের উঠানে দাঁড়িয়ে পুত্র সন্তানটিকেই গ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু তিনি নিঃসন্তান ছিলেন ফলতো তার অবর্তমানে তার সিংহাসনের রাজা করার জন্য তার একজন পুত্র সন্তানের প্রয়োজন হয়েছিল। তাই তিনি পুত্র সন্তানকে নিয়ে চলে যান, মৎস্যগন্ধার কোন প্রসঙ্গই তোলেন নি। আর এই মুহূর্তে মৎস্যগন্ধার যৌবন উপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে একজন ঋষি তাকে যে কামনা করছেন তারও কারণ পুত্র সন্তান লাভের বাসনায়। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা শাস্ত্রের সমূহ আদেশকে সত্য করে তুলতে বদ্ধপরিকর পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। নারী পুত্র সন্তানের জন্মদানের জন্যই কেবল ব্যবহৃত। তাতে তার সম্মতি থাক বা নাই থাক।

মৎস্যগন্ধাকে সমস্ত আশীর্বাদ এবং অভিশাপে ভোলাতে না পেরে পরাশর মুনি মৎস্যগন্ধার ওপর বল প্রয়োগ করতে চাইলেন। মৎস্যগন্ধা তার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করলেন –

“আমি নিম্ন বর্ণের সামান্য এক নারী। আপনি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণরা সমাজে নমস্য। একজন দাশনারীর হাত ধরা আপনার শোভা পাচ্ছে না।”^৯

এ কথার উত্তরে ঋষি পরাশর যে উত্তরটি দিলেন সেটিই আসলে সর্বজনগ্রাহ্য এবং বিজ্ঞানসম্মত কথা –

“কামনার কাছে উঁচু-নিচু বলে কিছু নেই। আমার কাছে তুমি রূপময়ী। বাসনার হোম তুমি। সাগররা পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী যুবতী বলে মনে হচ্ছে তোমায়। তাই তোমাকে কামনা করছি।”^{১০}

মনুসংহিতার মধ্যে ঋষি মনু যদি এই কথাটিই বলে যেতেন যে মানুষের প্রথম রিপু জাতপাতের উর্ধ্বে। তাহলে তাকে একবিংশ শতকের মানুষ কিছুটা হলেও মানবিক বোধসম্পন্ন বলে মনে করতে পারতো। কিন্তু তা না করে ব্রাহ্মণ যেহেতু ঈশ্বরের মুখ থেকে সৃষ্ট বর্ণ তাই কেবল তারাই চতুর্বর্ণের যে কোন নারীতে উপগত হতে পারে এ কথা বলার মধ্য দিয়ে সমাজের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা কায়ম করার পথ তিনি ব্রাহ্মণদের কাছে খুলে দিলেন। কিন্তু সত্যি কথা হল এই ব্রাহ্মণ ঈশ্বরের মুখসৃষ্ট জাতি বলে নয় কামনার বশবর্তী হয়ে যদি তারা যে কোন বর্ণে নারীতে উপগত হয় তাহলে তাদের যাতে শাস্তির ব্যবস্থা তেমন করে সমাজে তৈরি না হয়। ফলত যত অন্যায় অবিচার তারা চালিয়ে যাক সমাজের নিম্ন বর্ণের মানুষের উপর কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ হবার কারণে তাদের অন্যায় আচরণের বিচার করতে কেউ সাহস না পায়।

পরশর মুনির কামনায় মৎস্যগন্ধা নিজেকে ধরা দিতে না চাইলে পরাশর মোক্ষম অস্ত্রটি প্রয়োগ করেন। সেটি হল শাস্ত্র শ্লোক। কারণ নিম্ন বর্ণের সমাজের মানুষের কাছে শাস্ত্র আদেশ ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত কথার মত। শাস্ত্র আদেশ লঙ্ঘন করলে তাদের নরকগামী হতে হবে। এই শাস্ত্র ভয় দেখিয়ে পরাশর মৎস্যগন্ধাকে কুক্ষিগত করতে চাইলেন –

“তুমি ব্রাহ্মণ আর শূদ্রের কথা বললে। শাস্ত্রে আছে - ব্রাহ্মণ যে কোন বর্ণের নারীতে উপগত হতে পারে।”^{১১}

এই শাস্ত্র তো সুযোগ সন্ধানী স্বার্থবাদী ব্রাহ্মণরাই তৈরি করেছেন। নিজেদের জন্য তারা সমস্ত সুযোগই বরাদ্দ রাখবেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই মৎস্যগন্ধাকে যেহেতু ঔপন্যাসিক একবিংশ শতকের আঙিনায় তৈরি করেছেন ফলে তার সংলাপ প্রশ্নময় –



“ব্রাহ্মণের অন্য কোন বর্ণের পুরুষ কি ব্রাহ্মণীতে উপগত হতে পারে?”^{২২}

ঋষি পরাশর বলেন –

“চোখ বড় বড় করে মৎস্যগন্ধার দিকে তাকালেন ঋষি। বিব্রত গলায় বললেন, ‘তা কি করে হয়!’
নিজেকে আত্মস্থ করলেন। বললেন ‘শাস্ত্রে তো সে বিধান নেই!’”^{২৩}

মৎস্যগন্ধা বলেন –

“বিধান থাকবে কি করে? ওই বিধান তো নিম্নবর্ণের মানুষেরা তৈরি করেনি। শাস্ত্র তো বানিয়েছেন
আপনারা, আপনাদের মতো বামনেরা।”^{২৪}

পরাশর বলেন –

“শান্ত হও, নিজেকে সংযত করো মৎস্যগন্ধা। রাগের মাথায় কি বলছ – বুঝতে পারছ না তুমি। জানতে
অথবা অজান্তে তুমি ব্রাহ্মণ সমাজকে অপমান করছ।”^{২৫}

মৎস্যগন্ধা বলেন –

“সত্য কথা বলতে গেলে যদি আপনাদের গায়ে লাগে, শাস্ত্র নির্মাতাদের বিরোধিতা করা হয়, তাহলে
আমি নিরুপায়। আপনাদের তৈরি শাস্ত্র প্রথা কি অমানবিক নয়, এই ভারতবর্ষের বৃহৎ একদল মানুষকে
পায়ের তলায় পিষ্ট করার বিধি-বিধান কি আপনারা তৈরি করে যাননি? আপনাদের চোখে সমতা বলে
কিছু নেই। ...রোষকষায়িত চোখে বলল, নগরের বাইরে ঠেলে রেখেছেন তথাকথিত নিচু জাতের
মানুষদের। বলছেন, তারা অস্পৃশ্য। কিন্তু দেহ তাড়নায় তাদেরই কুঁড়েতে গিয়ে উঁকি মারেন
আপনারা।”^{২৬}

হরিশংকর জলদাস তার মৎস্যগন্ধা উপন্যাসে মৎস্যগন্ধা নামক এক জেলে কন্যাকে দিয়ে পরাশর ঋষি নামক এক ব্রাহ্মণের
কাছে এই সংক্ষিপ্ত প্রশ্নমালা তৈরি করিয়েছেন। খুবই সংক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র সেই প্রশ্নমালা কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ। এরপর তিনি তার
বাকি উপন্যাসে এই তর্ককে আর উপস্থাপন করবেন না। এই উপন্যাসের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে এই তর্কের সমাপ্তি ঘটেছে।
এরপর মৎস্যগন্ধা যোজনগন্ধা নামে, সত্যবতী নামে পরিচিত হবেন। বেদব্যাসকে জন্ম দেওয়ার জন্য তিনি এবং তার
পরিবার সকলে মিলে একটি সমবেত লড়াইয়ে সামিল হবেন। বেদব্যাসের চার বছর বয়সে পরাশর মুনি এসে বেদব্যাসকে
নিয়ে যাবেন। এরপর রাজা শান্তনুর সঙ্গে সত্যবতীর বিবাহ, হস্তিনাপুরের সিংহাসনের রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়া তারপর
সেখান থেকে অবসর নিয়ে বেদব্যাস এর সঙ্গে তার আশ্রমে চলে যাওয়া।

লক্ষণীয় বিষয় হল দ্বাদশ পরিচ্ছেদের মৎস্যগন্ধার শেষ কথাটি –

“এই ভারতবর্ষের বৃহৎ একদল মানুষকে পায়ের তলায় পিষ্ট করার বিধি-বিধান কি আপনারা তৈরি
করে যাননি?”^{২৭}

এই কথাটি আর মৎস্যগন্ধার সংলাপ হয়ে থাকেনি। মহাভারতের কালকে ছাড়িয়ে এ কথা হয়ে ওঠে জীবনে অনার্য হওয়ার
কারণে দীর্ঘ অসম্মান লাভ করা কথা সাহিত্যিক হরিশংকর জলদাসের কথা। কারণ এই ‘যাননি’ শব্দটি। যদি এটি
মহাভারতের কালের কথা হয় তাহলে বর্ণবাদীতার সমগ্র প্রক্রিয়াটি তখনো জারি রয়েছে। লেখক যখনই ‘যাননি’ ব্যবহার
করেন তাতে বোঝা যায় যে লেখক স্বীকার করে নিয়েছেন যে বর্ণবাদীতার সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়েছে। এখানে এই
‘যাননি’ শব্দবন্ধের মধ্য দিয়ে লেখক সরাসরি ঢুকে পড়েন এই তর্কের মধ্যে। তখন এই তর্ক কেবলমাত্র পরাশর মুনি এবং
মৎস্যগন্ধার থাকেনা তা হয়ে ওঠে সমগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদী মানসিকতা সম্পন্ন সমাজের সঙ্গে লেখক হরিশংকর জলদাসের তর্ক।
যে লাঞ্ছনাময় জীবন তিনি এবং তার সমগ্র পূর্বপুরুষেরা সহ্য করেছেন সেই সমগ্র নির্যাতনের প্রতিবাদ স্বরূপ এই ‘যাননি’
শব্দের ব্যবহার যথোপযুক্ত হয়েছে। শিক্ষিত সমাজে এখনো তিনি ‘জাইল্যার পোলা’^{২৮} বলে নিন্দিত হন বলে তিনি এই



তর্ককে জারি রাখেন, স্টেটমেন্ট দেন। মহাভারতের কাল নিয়ে মৎস্যগন্ধা উপন্যাস লিখতে বসে তিনি স্বয়ং মহাভারতের রচয়িতা বেদব্যাসকেও প্রশ্নের মুখে ঠেলে দেন এবং তাঁর ‘বর্ণবৈষম্যের শেকড়বাকড়’ বইতেই তিনি পাঠককে জানিয়েছেন–

“তিনি (ব্যাসদেব) ব্রাহ্মণ সন্তান যেমন শূদ্রাণী পুত্রও তেমনি। তার বাবা ঋষি পরাশর, মা মৎস্যগন্ধা। মৎস্যগন্ধা রাজার বীর্যে উৎপন্ন হলেও জেলের ঘরে মানুষ হয়েছেন। জেলে পরিবারে লালিত-পালিত এই কন্যাটির গায়ের রং ছিল আব্রাহ্মণ বা অক্ষত্রিয় সুলভ। তার গায়ের রং ছিল কালো, নমঃশূদ্র জেলেদের মত। জোর জবরদস্তির সন্তান কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের গায়ের রংও ছিল আলকাতরার মত কালো। ...মাতৃ পরিচয়টা যদি ভারতবর্ষে পিতৃপরিচয় চেয়ে মূল্যবান হয়, তাহলে ব্যাসদেবের প্রকৃত পরিচয় তিনি এক অনার্যকন্যা মৎস্যগন্ধার সন্তান। এই জেলে কন্যা মৎস্যগন্ধা সত্যবতী হয়ে শেষ পর্যন্ত হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদের প্রধান রাণী হয়েছেন। শুধু তাই নয়, ব্যাসদেবের ঔরস জাত সন্তানদের দ্বারা কুরু আর পাণ্ডব রাজবংশকে আচ্ছাদিত করিয়েছেন। অথচ ব্যাসদেব নিজের শূদ্রাণী পুত্র হয়েও ব্রাহ্মণ্যবাদীতার কাছে হাঁটু গেড়ে বসেছেন।”^{১৯}

উপরিউক্ত মৎস্যগন্ধার সমস্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর না দিয়ে মৎস্যগন্ধার দেহকে জবরদখল করে পরাশরন মুনি তাকে একপ্রকার ধর্ষণ করেছেন। এই ধর্ষণ পর্বের পরে তিনি মৎস্যগন্ধাকে দুটি আশীর্বাদ করেন - প্রথম, মৎস্যগন্ধার শরীর থেকে মাছের গন্ধ চলে গিয়ে শরীর পুষ্প গন্ধযুক্ত হবে। যোজন পথ দূর পর্যন্ত তার শরীরের সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়বে। দ্বিতীয় আশীর্বাদটি হল, ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে মৎস্যগন্ধা সত্যবতী নামে খ্যাত হবেন এবং ভারতবর্ষের বিখ্যাত এক রাজার সঙ্গে তার বিয়ে হবে।

এই দুটি আশীর্বাদই বিশ্লেষণ যোগ্য। কেননা এই দুটি প্রয়োজন মৎস্যগন্ধা অনুভব করেছেন কতটুকু। এই উপন্যাসের মধ্যে তো সেই অনুভব আমরা দেখি না। তাহলে মৎস্যগন্ধার শরীর থেকে মাছের গন্ধ চলে যাওয়ার ফলে মহারাজা শান্তনু তার দেহের গন্ধে আকুল হয়ে তাকে বিয়ে করতে ছুটে এসেছিলেন, তাও আবার শেষ বয়সে। অনেক বাধা পার করে সেই বিয়ে সম্পন্ন হয়েছিল। কিন্তু তার বিনিময়ে মৎস্যগন্ধার মত সামান্য নারী কি পেয়েছিল। একজন সাধারণ নারীর যা যা স্বপ্ন থাকে তা কিছুই তিনি পাননি। পুত্র পেয়েছিলেন দুজন একজন অহংকারী আর একজন কামান্দ। দুজনেই অল্প বয়সে মারা যান। কুরু বংশের সিংহাসনের জন্য তিনি বেদব্যাসের কাছে পুত্র ভিক্ষা করে পুত্র পেয়েছিলেন বটে কিন্তু তারাও দৈহিক দিক থেকে অক্ষম এবং দুর্বল ছিল। রাজাকে বিয়ে করে রাজরানী হয়ে মৎস্যগন্ধা সমগ্র জীবন জুড়ে বরং অশান্তি লাভ করেছেন। ফলত একজন ঋষির ধর্ষণের বিনিময়ে পাওয়া দুটি আশীর্বাদ নিয়ে মহাভারত কার আপ্ত হতে পারেন কিন্তু লেখক হরিশংকর জলদাস কোনভাবেই আপ্ত নন। তাই তিনি উপন্যাসের দ্বাদশ পরিচ্ছেদ জুড়ে এই তর্কের অবতারণা করেন।

Reference:

১. বর্ণবৈষম্যের শেকড়বাকড় হরিশংকর জলদাস, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২২, পৃ. ২৮-৩০
২. হরিশংকর জলদাসের অন্তরঙ্গকথা, মহি মোহাম্মদ, অবসর প্রকাশনা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, পৃ. ৬১
৩. ২০২৪ সালের মার্চ মাসের ২১ তারিখের নেওয়া ঘরোয়া সাক্ষাতকার।
৪. ২০২৪ সালের মার্চ মাসের ২১ তারিখের নেওয়া ঘরোয়া সাক্ষাতকার।
৫. মৎস্যগন্ধা উপন্যাস, হরিশংকর জলদাস, কথা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ৬০
৬. মৎস্যগন্ধা উপন্যাস, হরিশংকর জলদাস, কথা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ৬১
৭. মৎস্যগন্ধা উপন্যাস, হরিশংকর জলদাস, কথা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ৬১
৮. মৎস্যগন্ধা উপন্যাস, হরিশংকর জলদাস, কথা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ৬৩
৯. মৎস্যগন্ধা উপন্যাস, হরিশংকর জলদাস, কথা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ৬৭

১০. মৎস্যগন্ধা উপন্যাস, হরিশংকর জলদাস, কথা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ৬৭
১১. মৎস্যগন্ধা উপন্যাস, হরিশংকর জলদাস, কথা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ৬৭
১২. মৎস্যগন্ধা উপন্যাস, হরিশংকর জলদাস, কথা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ৬৭
১৩. মৎস্যগন্ধা উপন্যাস, হরিশংকর জলদাস, কথা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ৬৭
১৪. মৎস্যগন্ধা উপন্যাস, হরিশংকর জলদাস, কথা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ৬৭, ৬৮
১৫. মৎস্যগন্ধা উপন্যাস, হরিশংকর জলদাস, কথা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ৬৭
১৬. মৎস্যগন্ধা উপন্যাস, হরিশংকর জলদাস, কথা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ৬৮
১৭. মৎস্যগন্ধা উপন্যাস, হরিশংকর জলদাস, কথা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ৬৩
১৮. আমার কর্ণফুলী, হরিশংকর জলদাস, বাতিঘর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃ. ৯৪
১৯. বর্ণবৈষম্যের শেকড়বাকড় হরিশংকর জলদাস, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২২, পৃ. ২৬

Bibliography:

আরও গ্রন্থ :

হরিশংকর জলদাস, ‘মৎস্যগন্ধা’, কথা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০, দ্বিতীয় সংস্করণ জুলাই ২০২০

সহায়ক গ্রন্থ :

হরিশংকর জলদাস, ‘বর্ণবৈষম্যের শেকড়বাকড়’, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২২

হরিশংকর জলদাস, ‘আমার কর্ণফুলী’, বাতিঘর, বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ মার্চ ২০১৯

মহি মোহাম্মদ, ‘হরিশংকর জলদাসের অন্তরঙ্গকথা’, অবসর প্রকাশনা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

টুম্পা মন্ডল, ‘বাংলা সাহিত্য ও ধীর সংস্কৃতি’।

হরিশংকর জলদাস, ‘বর্ণবৈষম্যের শেকড়বাকড়’, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০২০

হামিদা বেগম, ‘বাংলাদেশের উপন্যাসে সমুদ্র উপকূলবর্তী জীবন ও জনপথ’, আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

ড. চিত্ত মণ্ডল ও ড. প্রথমা মণ্ডল, ‘বাংলার দলিত আন্দোলনের ইতিবৃত্ত’, একুশ শতক, কলকাতা, ১ ফেব্রুয়ারি, বইমেলা, ২০০৩

পত্র-পত্রিকা :

মহি মুহাম্মদ, কালি ও কলম পত্রিকা, ‘উপন্যাসের সমুদ্র সংগ্রামী কৈবর্ত জীবন’, ঢাকা, বাংলাদেশ ১২০৯

ইবন সাজ্জাদ, দৈনিক আজাদীর, ‘উপেক্ষিত বঙ্গোপসাগরের আহাজারি’।

পলাশ মজুমদার, সম্প্রীতি পত্রিকা, ‘বাংলাদেশের সাম্প্রতিক উপন্যাস’, বাংলাদেশ, জুন সংখ্যা ২০১৪

দেশ পত্রিকা, অমর্ত্য সেন, ‘ভারতের শ্রেণীবিভাগের তাৎপর্য’, ১৮ই জানুয়ারি সংখ্যা ২০০৩